ঋতুরঙ্গ

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২য় বার্ষিক শ্রেণী, সাহিত্য বিভাগ

কবি তাঁহার একটি চিঠিতে বলিয়াছেন—পূরবী ও মহুয়ার মাঝখানে আর একদল কবিতা আছে, যেগুলি অন্য জাতের। তাদের মধ্যে ঋতুরঙ্গই প্রধান। নৃত্যাভিনয়ের উপলক্ষ্য নিয়ে এগুলি রচিত হয়েছিলো। কিন্তু এরাও স্বভাবতই উপলক্ষ্যকে অতিক্রম করেছে। আর কোনও খানেই শান্তিনিকেতনের মতো ঋতুর লীলারঙ্গ দেখিনি; তারই সঙ্গে মানব-ভাষায় উত্তর-প্রত্যুত্তর কিছুকাল থেকে আমার চলছে। তবে রীতিমতো সুরু হয়েছে শারদোৎসবে—তারপর ঋতুগীতির প্রবাহ এসে পড়েছিলো ঋতুরঙ্গে। বিষয় এক তবু প্রভেদ যথেষ্ট।

শারদোৎসব, বসন্ত, বর্ষাবিদায়, ফাল্গুনী এই সমস্ত নাটিকার রূপ এবং রস একত্র করিয়া ঋতুরঙ্গ রচিত। বিষয় একই বটে, কিন্তু ধারা এক নহে। ধারা এক না হওয়াতেই রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ব জীবনের রচিত ঋতুবিষয়ক নাটিকাগুলির সহিত আধুনিক জীবনের রচিত নাটিকার অনেক পার্থক্য। শুধু নাটিকাই বা বলি কি করিয়া তাঁহার সমস্ত লেখাই পূর্ব্ব জীবনের লেখা হইতে পৃথক্। কাব্যকে আমরা বিচার করি ধারা দিয়া। ধারার পার্থক্য ঘটিলেই সঙ্গে সঙ্গে রূপ ও রসের পার্থক্য ঘটিবেই।

শারদোৎসব প্রভৃতি অসম্পূর্ণ; পড়িয়া আকাঙ্খা মেটে না। চোখের সামনে আরও কিছু ভাসে; মন তৃপ্তি পায় না। শরৎ

বলিলেই শীতের রুক্ষ প্রকৃতি আমাদের চোখের সামনে নাচিতে থাকে। গ্রীষ্ম বলিলেই বর্ষার বর্ষণক্লান্ত আকাশের প্রতিবিম্ব আমাদের মনের উপরে ভাসে। কিন্তু ঋতুরঙ্গ সম্পূর্ণ। কবি ঋতুরঙ্গে মনে অসম্পূর্ণতার ভাব আসিবার অবকাশ দেন নাই। কবি ঐ এক পত্রেই আর-এক জায়গায় বলিয়াছেন—"বারো মাসে পৃথিবী ছয় ঋতুতে বাঁধা, তাদের পুনরাবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, একবার আমার মন থেকে যে ঋতু যায় সে আর-এক অপরিচিত ঋতুর জন্য জায়গা ক'রে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করে। পূর্ব্বকালের সঙ্গে মেলেনা, এ হ'তেই পারে না। কিন্তু সে যেন শরৎএর সঙ্গে শীতের মিলের মতো।" এক ঋতু যায়, আর এক ঋতু আসে। ঋতুর যাওয়া-আশার সন্ধিক্ষণে তাহারা যেমন বাহিরের প্রকৃতির উপর ছাপ মারিয়া চলিয়া যায় সেইরূপ মনের উপরও ছাপ মারে। বাহিরের প্রকৃতি যেমন ঋতুপরিবর্ত্তনের সময় তাহার ছাপ তাহার বুকের উপর মারিয়া নেয় সেইরকম মনেও তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে। প্রকৃতির সঙ্গে মনের মিল এইখানেই। মনের উপর যে ছাপ পড়ে কবি সেই ছাপটিই কাগজের বুকে প্রতিবিম্বিত করেন। এই প্রতিবিম্ব ফেলাইতে তিনি ঋতুরঙ্গে যত সক্ষম হইয়াছেন আর কোন কাব্যেই তত সক্ষম হন নাই।

ঋতুরঙ্গকে নাটিকা পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। কারণ আমরা নাটক বলিতে যাহা বুঝি ঋতুরঙ্গ তাহা নয়। নাটকে যেগুণ না থাকিলেই নয় ঋতুরঙ্গে তাহা নাই। নাটকের প্রধান বিশেষত্ব হইল অন্ততঃপক্ষে দুইজন লোক থাকা চাই। তাহারা কথোপকথনের ভিতর দিয়া গ্রন্থকারের বক্তব্য বিষয় শ্রোতাদিগকে জানাইয়া দেয়। এই দিক হইতে ঋতুরঙ্গকে নাটক বলা চলে না। কেননা ইহাতে ঋতুর পর ঋতুর উদ্বোধন, সম্বোধন, আবাহন, মিনতি

এবং বিদায় একমাত্র কবির মুখ দিয়াই বাহির হইতেছে। কাজেই ইহাকে নাটিকা বলা চলে না। ইহা একটি গীতিকাব্য—ঋতুগীতির প্রবাহ। নাটক না হইলেও অভিনয়-কালে ইহা কোথাও বাধা পায় না। শ্রোতার মনে অতৃপ্তির ভাব আসিবার অবসরই পায় না।

নটরাজ নাচিতেছেন। সমস্ত জগৎ-নৃত্যের যখন যে-সুর সেই সুরে সুর মিলাইয়া এক ঋতু আসিতেছে, বিদায় লইতেছে, আবার আর-একটি ঋতু আসিয়া, তাহার স্থান অধিকার করিতেছে, আবার বিদায় লইতেছে। নটরাজের নৃত্যের বিরাম নাই—

"নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব নাচের দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে ;
অন্ত কে তার সন্ধান পায়
ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে ॥"

নটরাজের নৃত্য কখনও বা ভয়ঙ্কর, কখনও বা মৃদু, কখনও বা কোমল। তাহার নৃত্যের তালে তালে বিশ্বজগৎ কাঁপে। তাহার মঞ্জীরের আঘাতে আঘাতে সুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায়, চিত্তে মুক্ত সুরের

ছন্দ জাগে। বিশ্বের সকলের মনে এমন কি অণুপরমাণুতেও তাহার নৃত্যের ছায়া পড়ে। সৃষ্টির মূলে তাহার নৃত্য।

"নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল ' '
বিদ্রোহী পরমাণু ;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে
বাঁধিলে চন্দ্র ভানু।"

নৃত্যের তালে তালে একটি ঋতুর পর আর-একটি ঋতু আসিতেছে। পুরাতনকে দূর করিয়া দিয়া নূতন তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। নির্ম্মম হস্তে পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া দিতেছে।

"অন্তরের ঘূর্ণিঝড়ে
শীর্ণ যাহা ঝড়িয়া পড়ে,
প্রাণের জয়-তোরণ-গড়ে
আনন্দের তালে,
বসন্তের যাত্রা চলে অনন্তের পানে॥"

[ক্রমশঃ]